রূপসী বাংলার
দুই কবি

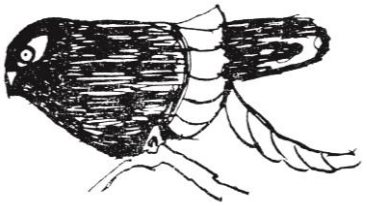

পূর্ণেন্দু পত্রী

রূপসী বাংলার দুই কপি
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
উমা পত্রী

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৪৭৫ টাকা

Rupasi Banglar Dui Kobi by Purnendu Pattrea Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Published: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 475 Taka RS: 475 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97450-2-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

শ্রদ্ধেয় শ্রীসাগরময় ঘোষকে

প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬০
প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২
মুদ্রক : শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস
১৮৬/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৪

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় সাগর দা-র উৎসাহেই এই রচনাটি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়। তিনিই এই রচনার প্রথম পাঠক। বই করতে গিয়ে ঘটেছে অনেক নতুন তথ্যের সমাবেশ। 'দেশ'-এ প্রকাশিত রচনার এটি একটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ বলাই ভালো। বহুজনের সাগ্রহ সাহায্য পেয়েছি লেখা এবং ছবি দুই ব্যাপারেই। অফুরন্তভাবে বই জুগিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ।

দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করে দিয়েছেন সুনীল নন্দী এবং সুবীর ভট্টাচার্য। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'-র পাণ্ডুলিপি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন শ্রীমতী নলিনী দাশ ও অশোকানন্দ দাশ। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রিত পাণ্ডুলিপি পেয়েছি শান্তিনিকেতন-বাসী শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। অবনীন্দ্রনাথের রঙিন ছবি ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন যথাক্রমে রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি, শ্রীমতী শ্যামশ্রী ঠাকুর ও বাদশা ঠাকুর। নানা ব্যাপারে সাহায্য করেছেন পার্থ বসু ও পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

প্রকাশনার ব্যাপারে আন্তরিক উৎসাহ দেখিয়েছেন 'আনন্দ পাবলিশার্স'-এর বাদল বসু। এঁদের সকলের কাছেই আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

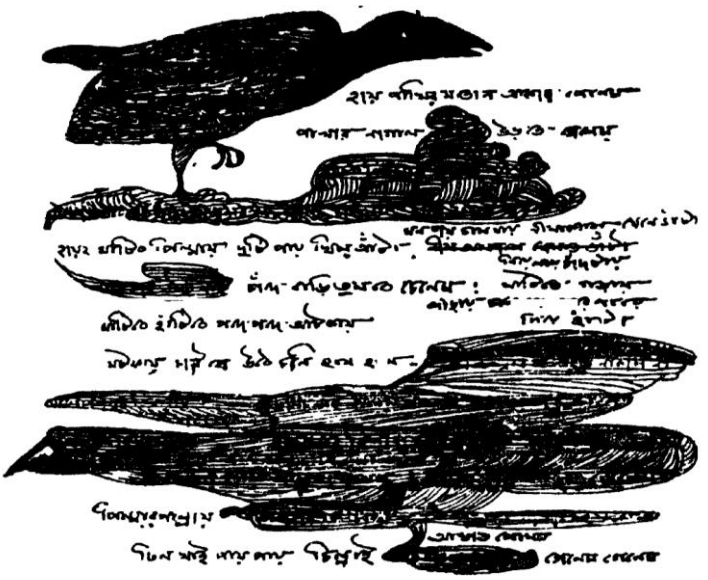

কবি অবনীন্দ্রনাথ

একবার য়ুরোপ সফর শেষ করে দেশে ফিরেই রবীন্দ্রনাথ তলব করলেন ভাইপোকে।

অবন, বিলেতে, ফ্রান্সে, সুইডেনে, জার্মানিতে সব জায়গায় তোমার কত বন্ধু, ভক্ত রয়েছে দেখলুম। তাদের সঙ্গে আমার আলাপ হল। তোমার একবার সেখানে যাওয়া উচিত। প্যারিস, ল্যাটিন কোয়ার্টার আর সব কিছু তোমার নিজের চোখে দেখে আসা দরকার।

ভাইপোর মুখে তখন গড়গড়ার নল। এক ঝলক ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দিলেন তিনি—

আমি শিল্পী। মানসচক্ষে দেখতে পাই সব, ঐ ধোঁয়ার মধ্যে। হুগো বালজাক যখন পড়েছি, তখন আর নিজের চোখে প্যারিস দেখার দরকার হবে না। তুমি আমাকে বলো, আমি হুবহু ল্যাটিন কোয়ার্টারের ছবি এঁকে দিচ্ছি।

এই কথাগুলো অথবা এই মনোভঙ্গিকে নিঙড়িয়ে নির্যাস করে গদ্যের বদলে কবিতার ছন্দে বলতে বলা হোতো অবনীন্দ্রনাথকে, কী উত্তর দিতেন তিনি তা লিখে গেছেন জীবনানন্দ।

"তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব";

আশ্চর্য! একজন শিল্পীর মনের খবর হুবহু আরেকজন কবির কলমে। তাহলে কী মনে গভীরতম মহলে মিল ছিল এঁদের দুজনের? কিন্তু সে অনুসন্ধানের প্রথম পর্বে মিলের চেয়ে অমিলটাই চোখের সামনে খাড়া হয়ে ওঠে স্তূপাকারে। দুটো ভিন্ন যুগের মানুষ এরা দুজন। একজনের বিকাশ অভিজাত পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। আরেকজন বড় হয়েছেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের মধ্যপর্বে মধ্যবিত্ত চেতনার সবচেয়ে সংঘর্ষময় পটভূমিকায়। একজনের সৃষ্টির শুরু ফলের বোঁটাকে মনে রেখে, ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করেও নতুন ঐতিহ্য রচনার তপস্যায় মেতে। একজন য়ুরোপীয় চিত্রকলার স্বাদ নিয়েছেন দূর থেকে গন্ধে-ঘ্রাণে, জিভের ছোঁয়ায় নয়। আরেকজন য়ুরোপীয় সাহিত্যের সর্বাধুনিক স্রোতে স্নান করেছেন সাঁতার কেটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কামান-বিমান যখন বিশ্বের যাবতীয় প্রাচীন মূল্যবোধের দেয়ালকে দিয়েছে ঝাঁঝরা করে, একজনের সৃষ্টির কাজ তখন প্রায় সারা হওয়ার মুখে। আর অন্যজনের সূত্রপাত সেই বিশ্বজোড়া ভস্মরাশির দিকে তাকিয়ে। একজন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। আরেকজন বিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত সমাজ বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী।

বিপরীতমুখী এমন দুটি চরিত্রের মধ্যে মিল খুঁজতে যাওয়া যখন মনে হচ্ছিল নিতান্তই অহেতুক, ঠিক সেই মুহূর্তে মনের মধ্যে ঝম্‌ঝমিয়ে বেজে উঠলো একটা সত্য, এঁরা দুজনেই কবি।

কবি? জীবনানন্দ দাশ যে কবি, তা আমরা সর্বান্তকরণে জানি। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ? তিনি তো প্রধানত চিত্রকর। পরবর্তী পরিচয়ে শিশু সাহিত্যের এক পরমাশ্চর্য জাদুকর। কিন্তু কবি নন কখনোই। কবিতা লিখেছেন যদিও কয়েকটি। কিন্তু সে মুষ্টিমেয়তার শরীরে এমন শক্তি নেই যে, তাকে সগৌরবে খাড়া করা যাবে জীবনানন্দের অফুরন্ত সৃষ্টির পাশে, সমকক্ষরূপে। তাহলে?

একটু স্মরণ করিয়ে দিলেই হয়তো আমাদের মনে পড়বে, বাংলা সাহিত্যে আরো একবার উচ্চারিত হয়েছিলো অবিকল এই জাতীয় জিজ্ঞাসা। প্রবন্ধের নাম, এক গ্রীষ্মে দুই কবি। প্রবন্ধকার, বুদ্ধদেব বসু। সেখানেও প্রশ্ন ছিল—

"কবিতাই যদি আলোচ্য বিষয় তাহলে ডস্টয়েভস্কির স্থান হয় কেমন করে?"

আর প্রবন্ধকার তার উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—

"বলা যেতে পারে, সাহিত্যের যা সারাৎসার তা-ই কবিতা; কবিতা বলে তাকেই যা বিবরণ নয়, বর্ণনা নয়, মন্তব্য নয়, যা জীবনের মুকুরমাত্র না-হয়ে জীবনের সমান্তর এক সৃষ্টি হয়ে ওঠে; বুদ্ধির অতীত এক চঞ্চলতায় নিক্ষেপ করে আমাদের, যেখানে বহু ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি দ্যুতি ও ছায়া পরস্পরে মিশ্রিত হয়ে অনির্বচনীয়ের আভাস এনে দেয়। আর এই অর্থে এমন কোন শিল্পকলা নেই, যা কবিতার দ্বারা

আক্রান্ত না হয়—সব সময় নয়, নিয়ম হিসেবে নয়, কিন্তু কখনো কখনো। টোমাস মান বা ডস্টয়েভস্কির মতো লেখককে 'কবি' আখ্যা দিতে নারাজ হবেন শুধু তাঁরাই যাঁরা গদ্য ও পদ্যের তফাৎ বুঝলেও গদ্য মন বা কবি মনের প্রভেদ বোঝেন না।"

কবি-মনের হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ এক কথায় কবি। তবু আরও একটু খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া যাক, কবি-কৃতির অবনীন্দ্রনাথকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় কিনা!

বয়স তখন ১৭। শিক্ষানবিশি চলেছে ছবি আঁকায়, বিদেশি শিক্ষকের কাছে। হাত পাকেনি। সেই সময়েই সংগোপনে, ঠাকুরবাড়ির সমস্ত কীর্তিমানদের চোখের আড়ালে, হাত লাগালেন এক দুরূহ কাজে। একই সঙ্গে দুটো কাজ। কবিতার অনুবাদ এবং সে-কবিতার চিত্রাংকন।

টমাস মুরের Lalla Rookh তখন সাহিত্য-সেবীদের পাড়ায় সমাদৃত। অবনীন্দ্রনাথ সেই দীর্ঘ কাহিনি-কাব্য থেকেই বেছে নিলেন নিজের মনের মতো একটা অধ্যায়। Fire-wood Worshiper. অনুবাদে নামকরণ করলেন, অগ্নি-উপাসক।

যে বয়সে অবনীন্দ্রনাথ হাত দিয়েছেন কবিতায় অথবা কবিতার অনুবাদে, হয়তো সেই বয়সেই জীবনানন্দ হাত দিয়েছিলেন ছবি আঁকায়। হয়তো বলতে হলো, কারণ সঠিক বয়সের হিসেবটা আমাদের জানা নেই। জানা আছে, বোন সুচরিতা দাশের স্মৃতি-চারণা থেকে, কৈশোরে তিনি মন দিয়েছিলেন ছবিতে। কাগজের ওপর পেনসিলের আলতো চাপ দিয়ে, গাছতলায় বসে চলত তাঁর চিত্র-চর্চা। সংবাদ শুধুমাত্র এইটুকুই। কিন্তু আরো একটু বেশি জানতে পারলে, তাঁকে আরেক রকমভাবে চেনা যেত।

'অগ্নি-উপাসক'-এর জন্যে অবনীন্দ্রনাথ নিজের হাতে বানিয়ে নিলেন পাণ্ডুলিপির খাতাটি। ছোট্ট আকারের বইয়ের মতো। ভিতরে ছবির সংখ্যা ৬। ছবির পাশের পাতায় কবিতার উদ্ধৃতি। পুরো পাণ্ডুলিপিটা যেদিন শেষ আঁকায় এবং লেখায়, তারিখটা ছিল ১৮৮৮, ৩ জুলাই। তখনও অবশ্য কবি এবং শিল্পী দুই অবনীন্দ্রনাথেরই হাত পাকতে অনেক বাকি। 'অগ্নি-উপাসক'-এর সেই সব ছবি এবং অনুবাদ দেখে ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের মতো দৈবজ্ঞানসম্পন্ন জ্যোতিষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল না যে, ইনিই আনবেন ভারতীয় চিত্রশিল্পের জগতে আমূল ওলোট-পালোটের ঝড়, অথবা এঁর কলমেই জন্ম নেবে বাংলার সাহিত্যে কথা এবং কবিতার এক স্বতন্ত্র শিল্পলোক।

'অগ্নি-উপাসকে'র ৬ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ ডাক দিলেন ভাইপোকে, তাঁর সদ্য সমাপ্ত 'চিত্রাঙ্গদা'কে অলংকৃত করতে। রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা লিখেছিলেন কটকে বসে। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাংকনও সম্ভবত ঐখানেই। ইতোমধ্যে তুলি-কালিতে হাত কিছুটা পাকা। গিলার্ডির কাছে আঁকা-শেখার পালা শেষ। সচিত্র চিত্রাঙ্গদা যেদিন

ছাপানো বই হয়ে বেরোল, দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ সে-বই উৎসর্গ করেছেন ভাইপোকেই। উৎসর্গ পত্রের বয়ান—

"বৎস, তুমি আমাকে তোমার যত্ন রচিত চিত্রগুলি উপহার দিয়াছ, আমি তোমাকে আমার কাব্য এবং স্নেহ আশীর্ব্বাদ উপহার দিলাম।"

এই চিত্রাঙ্গদা-চিত্রণের সূত্রেই রবিকাকার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার শুরু।

"চিত্রাঙ্গদা তখন সবে লেখা হয়েছে। রবিকা বললেন, ছবি দিতে হবে। আমার তখন একটু সাহস হয়েছে, বললুম, রাজি আছি। সেই সময় চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি নিজ হাতে এঁকেছি, ট্রেস করেছি। চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত হল। এখন অবশ্য সে ছবি দেখলে হাসি পায়। কিন্তু এই হল রবিকাকার সঙ্গে আমার প্রথম আর্ট নিয়ে যোগ। তারপর থেকে এতকাল রবিকাকার সঙ্গে বহুবার আর্টের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হয়েছে, প্রেরণা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। আজ মনে হচ্ছে আমি যা কিছু করতে পেরেছি তার মূলে ছিল তাঁর প্রেরণা।"

কবিতার চিত্রাংকন-এর যদি খাঁটি হিসেব-নিকেশ নিতে হয়, তাহলে দেখতে পাবো, 'অগ্নি-উপাসক' এবং 'চিত্রাঙ্গদা'-র মাঝখানে রয়ে গেছে তাঁর উদ্যমের আরও একটুখানি রঙিন ইতিহাস। তা হলো দ্বিজেন্দ্রলালের 'স্বপ্ন প্রয়াণে'র ছবি। চিত্রাঙ্গদা চিত্রিত করেছিলেন স্বয়ং কবির ডাকে। 'স্বপ্ন প্রয়াণ' শিল্পীর নিজের স্বতোৎসারিত আবেগে। 'চিত্রাঙ্গদা'-য় ছবির পরিমাণ অনেক। রেখা-চিত্রের সংখ্যা, ৩২। কবিতার মূল বিষয় নিয়ে পুরো পাতার ছবির সংখ্যা, ৮। সেখানে 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-র ছবির সংখ্যা, মাত্র দুই। এই ছবিই গোটা পরিবারের দৃষ্টিকে টেনে এনেছিল তাঁর দিকে। এরপরই গিলার্ডের কাছে ছবি-আঁকার হাতেখড়ি।

"... বড় হয়েছি, বিয়ে হয়েছে, বড় মেয়ে জন্মেছে, সেই সময় একদিন খেয়াল হল 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'টা চিত্রিত করা যাক। এর আগে ইস্কুলে পড়তেও কিছু কিছু আঁকা অভ্যেস ছিল। সংস্কৃত কলেজে অনুকূল আমায় লক্ষ্মী সরস্বতী আঁকা শিখিয়েছিল। বলতে গেলে সেইই আমার প্রথম শিল্প শিক্ষার মাস্টার, সূত্রপাত করিয়ে দিয়েছিল ছবি আঁকার।

তা 'স্বপ্ন প্রয়াণে'র ছবি আঁকবার যখন খেয়াল হল, তখন আমি ছবি আঁকায় একটু একটু পেকেছি। কি করে যে পারলুম মনে নেই, তবে নিজের ক্ষমতা জাহির করবার চেষ্টা আরম্ভ হল 'স্বপ্ন প্রয়াণ' থেকে। 'স্বপন রমণী আইল অমনি, নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ', এমনি সব ছবি, তখন সত্যি যেন 'খুলে দিল মনোমন্দিরের চাবি'। ছবিখানা 'সাধনা কাগজে বেরিয়েছিল।"

কবি অবনীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে চিত্রাঙ্গদা অথবা স্বপ্ন প্রয়াণের ছবির প্রসঙ্গ টেনে আনা হলো একটা স্বতন্ত্র প্রয়োজনে। অগ্নি-উপাসকে যার খেলাচ্ছলে শুরু, স্বপ্ন প্রয়াণ আর চিত্রাঙ্গদা-য় যার ঈষৎ পরিণতি, তাতে দেখতে পাই, তাঁর ভিতরে স্পন্দিত হয়ে চলেছে কবিতার সঙ্গে অথবা কবিতার কাছাকাছি বসবাসের

বাসনা। আর এর পর থেকে তাঁর সমগ্র চিত্র-সাধনার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবো, প্রত্যেক অধ্যায়ের মোড়-ফেরার মুখে প্রেরণার উৎস রূপে দাঁড়িয়ে আছে কবিতা। কবিতাই তাঁকে বারে বারে উস্‌কে দিয়ে এক প্রদীপে জ্বালিয়ে দিচ্ছে নানান শিখার আলো। কবিতার সঙ্গে তাঁর এই আধাগোপন প্রেম জীবনের শেষ বেলা পর্যন্ত ফুরোয়নি।

রবি বর্মার যুগের য়ুরোপীয় ধাঁচের নকলনবিশির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ যেদিন কাঁচা হাতে উদ্বোধন করলেন ভারত শিল্পের, আঁকলেন দেশি-গড়নের ছবি, সেদিনও, সেই প্রথম সম্ভাবনাময় সৃজনের পিছনেও প্রেরণার উৎস ছিল কবিতা। বৈষ্ণব পদাবলি।

"তখন একতলার বড় ঘরটাতে একধারে চলেছে বিলিয়ার্ড খেলার হো হো, একধারে আমি বসেছি রং, তুলি নিয়ে আঁকতে। দেশের শিল্পের রাস্তা তো পেয়ে গেছি কিন্তু আঁকবো কি? রবিকাকা আমায় বললেন, বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে ছবি আঁকতে। রবিকাকা আমাকে এই পর্যন্ত বাতলে দিলেন যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে। লেগে গেলুম পদাবলী পড়তে। প্রথম ছবি করি ভারতীয় পদ্ধতিতে গোবিন্দ দাসের দু লাইন কবিতা—

পৌখলী রজনী পবণ বহে মন্দ
চৌদিশে হিমকর, হিম করু বন্দ।

... সেই আমার প্রথম দেশী ছবি 'শুক্লাভিসার'।"

শুক্লাভিসার ছবির সঙ্গেও আগাগোড়া গাঁথা ছিল কবিতার ১৪টি লাইন উপরে নিচে দু-ভাগ হয়ে। এর পর ধাপে ধাপে সার্থকতার দিকে এগিয়েছেন সবল হাতে, শক্ত পায়ে। তখনো ছবির উপাদান সংগ্রহ অথবা সঞ্চয় করে চলেছেন কবিতা ভাঁড়ার থেকেই। কবিতার প্রেরণা কৃষ্ণলীলা ছবিতে। কৃষ্ণলীলার পরে ঋতুসংহারে। ঋতুসংহারের পরে মেঘদূতে। কালিদাসের বর্ষা-বসন্ত, যক্ষের-বিরহ, অলকার প্রাসাদ, উত্তর মেঘ পূর্বমেঘের আলোছায়া, সবকিছুকেই তিনি জীয়ন্ত করছেন তুলির টানে, রঙের আভাসে-ইঙ্গিতে। আরো পরে, 'কচ ও দেবযানী'। এখানেও উৎসমুখে দাঁড়িয়ে আছে কবিতা, রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ'। 'ভারতী' পত্রিকায় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন—

"যিনি রবিবাবুর 'বিদায় অভিশাপ' পড়িয়াছেন, তিনি এই চিত্রের মাধুর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।"

প্রতিবাদ জানিয়েছিল 'সাহিত্য', যে-কোনো রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সৃজনের ক্ষেত্রে যে-কোনো রকম নতুন স্বাদ-ভঙ্গি-বক্তব্যের বিকট বিরোধিতা করাই ছিল যে-পত্রিকার মহান ব্রত অথবা সংকল্প। সেখানে, বলা বাহুল্য, মহাআড়ম্বরে বেজে উঠল নিন্দাবাদ।

"আমরা বহুবার 'বিদায় অভিশাপ' পড়িয়াছি এবং কাব্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি।

কিন্তু কচ ও দেবযানী চিত্রের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইতে পারিলাম না। হয়তো আমরা চাষা, এ চিত্রের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে অক্ষম।..."

কচ ও দেবযানীতে যেমন রবীন্দ্রনাথ, 'রুক্মিণীর পর লিখন'-এ তেমনি মাইকেল মধুসুদন। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' থেকে বেছে নিয়েছিলেন এ ছবির বিষয় এবং আবেগ।

এর পরের পর্বে এলো ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ। রুবাইয়াৎ-এ পৌঁছবার আগে হাফেজ-এর ছায়া পড়েছিল একাধিক ছবিতে। রুবাইয়াৎ নিয়ে ছবি আঁকলেন মোট বারোটা। না নিজেকে, না কোনো পূর্বসূরীকে অনুসরণ করলেন এখানে। এ যেন আনকোরা নতুন, পিতৃমাতৃহীন।

"In the illustrations of Omar Khayyam we see for the first time Abanindranath's work showing a definite individual style. This series is a land mark in Abanindranath's style. For the first time we see texture, atmosphere, deep interest in portraiture and dramatic expression." বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

এর পরের ধাপে চণ্ডীমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল। দেখা গেল কবিতায় সারল্য এবং বলিষ্ঠতা তাঁর ছবিকেও ভরিয়ে দিয়েছে এক ভিন্ন জাতের তেজে, দীপ্তিতে, দৃঢ়তায়।

"কৃষ্ণমঙ্গল সিরিজ, কবিকঙ্কন সিরিজ যখন রচনা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, তখন ভাবলোক থেকে কঠিন আকার সম্বন্ধে শিল্পী অনেক বেশী সচেতন। মনে হয় যেন শিল্পীর সফল উপলব্ধি দৃঢ়বদ্ধ রঞ্জিত আকারে রূপান্তরিত হয়েছে। উজ্জ্বল সংঘাতপূর্ণ বর্ণের প্রয়োগে এই সময়ের চিত্র রঞ্জিত মূর্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। পশুপক্ষী, গাছ একত্রিত হয়ে প্রাণমন গতিপ্রবাহ এই সময়ের রচনার সর্বপ্রধান আবেদন।... এই চিত্রাবলী রচনার কালে অবনীন্দ্রনাথ আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করেননি। মেজাজ অনুযায়ী জল রঙ, প্যাস্টেল, চারকোল, মিশিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হননি তিনি।...

এই সব চিত্র রচনাকালে অবনীন্দ্রনাথ যে অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন সেক্ষেত্রে বিষয়াশ্রিত বস্তু, ভাব অপেক্ষা ভঙ্গি, বর্ণের তরলতা অপেক্ষা কঠিনতা, মাধুর্য অপেক্ষা গাম্ভীর্য দর্শকের মনে যে ভাব জাগায় সেখানে আবেগ সর্বপ্রধান। বুদ্ধিমার্গীয় চিন্তার কোন অবকাশ নেই।" বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

কবিতার বিষয়গত আবেগের সঙ্গে তাঁর শিল্পকলারও ভঙ্গি এমনি করেই বদলে গেছে বারেবারে। আমরা সহজেই বুঝতে পারি কবিতার যথার্থ অনুভূতিকে স্পর্শ করার মতো সংবেদনশীলতা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কতখানি তাজা ছিল তাঁর ভিতরে। মঙ্গলকাব্যের আগেই হাত দিয়েছিলেন গীতাঞ্জলি আর Fruit Gathering এর অলংকরণে। ইংরেজি গীতাঞ্জলির জন্যে ছবি এঁকেছিলেন ৫টা। Fruit Gathering জন্যে ৭টা। সেখানে ভিন্ন অবনীন্দ্রনাথ। কবিতার মর্মস্বরের সঙ্গে ছবির মর্মবাণীকে একতানে জুড়ে দিলেন স্বচ্ছন্দে, অবলীলায়।

এসব ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণব কবিতার কাছ থেকে কত যে উপকরণ কুড়িয়েছেন, তার শেষ নেই। এর রাখাকেই তো সাজিয়েছেন কত সাজে। তাঁর প্রথম যে রাধাকে দেখলুম 'কৃষ্ণলীলা' সিরিজের ছবিতে, সে যেন ঈষৎ রুগ্ণ, শ্রীহীন, যেন রাধা নয়, রাধার খসড়া। সেই খসড়া থেকেই রূপ বদলে বদলে জন্ম নিতে লাগল নতুন নতুন রাধা।

কবিতার চিত্রকর যে অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানা হলো অনেক। কিন্তু এত জানার পরেও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, প্রমাণিত হলো কি যে তিনি কবি? উত্তর একটাই। না। কবিতা বুঝে ওঠা বা কবিতায় প্রাণিত হওয়া আর কবিতা রচনা করা, দুই স্বতন্ত্র ভুবন। দুয়ের মাঝখানে স্থির সুনিশ্চিত কোনো সেতু নেই। রস নিঙড়ে কবিতা পান আর নিজেকে নিঙড়ে কবিতার রস ঝরানো, দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে বলেই কবি উপাধির রাজমুকুট সকলের মাথায় গিয়ে পৌঁছয় না। তাই দেখা যায়, সকলে নয়, জীবনানন্দের নির্দেশমতো কেউ কেউ মাত্র কবি।

তাহলে? অবনীন্দ্রনাথকে আমরা কবি বলবো প্রত্যয় অথবা প্রমাণের কোন শক্তি জমিতে পা রেখে? অথবা আরও সরল করে নেওয়া যাক প্রশ্নটাকে। 'কবি অবনীন্দ্রনাথ' বলতে পারি অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে এমন কোনো ভিন্ন অস্তিত্ব সত্যিই আছে কি কোনোখানে?

এর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর, আছে। সবচেয়ে বিশ্বস্ত উত্তর, আছে, খুঁজে নিতে হবে। শীতের দিনের পা পর্যন্ত ঝোলানো শালের নকশা আমাদের চোখের সীমানা থেকে সরিয়ে রাখে অন্য সব পরিধানের শ্রী-সৌন্দর্য। অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বেলাতেও ঘটেছে তেমনি। তাঁর শিশুসাহিত্যটাই মহামূল্য শালের মতো আমাদের চোখের সামনে চার প্রহর ধরে পাতা। আর তারই জৌলুসে ঢাকা পড়ে গেছে তাঁর বাকি সব কৃতিত্বের কারুকাজ।

অবনীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি আমাদের ঔদাসীন্যতাই উল্লেখযোগ্য। ঔৎসুক্যটা নগণ্য। তাঁর গদ্য কবিতার ছন্দ এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেছেন যে দুজন সমালোচক, সৌভাগ্যবশত তাঁরা দুজনেই কবি। অশোকবিজয় রাহা এবং শঙ্খ ঘোষ। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আরও একজন কবিকে, শিশুসাহিত্যের সর্ববাদীসম্মত সম্রাটকে যিনি প্রথম সসম্মান আসন পেতে দিয়েছিলেন স্বীকৃত কবিদের সারিতে। এ ঘটনা ঘটেছিল, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'য়। অবশ্য সেখানেও চোখে পড়ে এক আশ্চর্য অঘটন। অবনীন্দ্রনাথের লেখা গদ্যকবিতার বদলে বুদ্ধদেব তাঁর সংকলনের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন 'আলোর ফুলকি'র একটুকরো মন্ত্রময় অংশ। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যই যে কবিতা, তার একটা চাক্ষুষ প্রমাণ বাংলা কবিতানুরাগীদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলাটাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের সাহিত্যে গদ্য কবিতার যিনি প্রথম সার্থক স্রষ্টা, শুনলে অবাক লাগে, সেই রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে গদ্যকবিতার প্রথম ফসল ফলানোর জন্যে উত্তেজিত করেছিলেন নিজেকে নয়, এমন দুই ব্যক্তিকে, যাঁরা দুজনেই জাদুকর। একজন ছন্দের। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আরেকজন রূপ, রেখা ও রঙের। তিনি অবনীন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ সাগ্রহে সায় দিয়েছিলেন এ প্রস্তাবে, কিন্তু ঘাড় পাতেননি কাজে। অবনীন্দ্রনাথ জানতেন কবিতার এই শুকনো ডাঙায় হাঁটতে গেলে গলায় বরমাল্যের বদলে কপালে কলসীর কানা জোটারই সম্ভাবনা বেশি। তবুও যে তিনি কোমর বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন ছন্দ ভাঙার এমন দুরূপ কাজে, তার কারণ সম্ভবত এই যে, লোকনিন্দা ততদিনে তাঁর কাছে আর নতুন কোনো উপদ্রব অথবা অন্তরায় নয়। চিত্রসৃষ্টির পর্বে পর্বে রক্ষণশীলদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং সৌজন্যহীন আক্রমণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বড় নিবিড়।

"অবনীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা রচনার একটুখানি ইতিহাস আছে, আর তা আমাদের এ-যুগের কবিতার শিল্প-বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। 'পুনশ্চ'-র ভূমিকা থেকে জানতে পারি, গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ 'কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে' দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল, 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে...বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা'। প্রথমে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন এটা পরীক্ষা করে দেখতে। সত্যেন্দ্রনাথ 'স্বীকার করেছিলেন কিন্তু চেষ্টা করেননি।' তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরীক্ষা করেছেন, 'লিপিকার অল্প কয়েকটি কবিতায় সেগুলি আছে'—যদিও ছাপাবার সময় ছত্রগুলিকে পদ্যের মতো সজ্জিত করা হয়নি। এদিকে রবীন্দ্রনাথের 'অনুরোধক্রমে আবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত এই যে, 'তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি।'... কিন্তু এ-ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথের নিজেরও একটা বড় কৃতিত্ব আছে; গদ্য কবিতা সম্বন্ধে একটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনকেও দ্বিধা-মুক্ত করেছেন তিনি।"

অশোকবিজয় রাহা

অবনীন্দ্রনাথের হাতে গদ্যকবিতা শরীর পেল কিন্তু আত্মা পেল না, অথবা জন্ম নিয়েও সাবালক হতে পারল না এটাও যেমন সত্যি, আবার তাঁর এই ব্যর্থতাই রবীন্দ্রনাথের নিজের সৃষ্টির বেলায় হয়ে উঠল এক নির্ভুল পথপ্রদর্শক এও তেমনি সত্যি। গদ্যকবিতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম চেষ্টা, 'লিপিকা'। কিন্তু সেখানে তিনি কবিতার বাক্যগুলোকে পদ্যের ছন্দের সিঁড়ির মতো করে ভাঙেননি, ভাঙতে পারেননি নিতান্তই ভীরুতার বশে। দশ বছর পরে 'পুনশ্চে' পারলেন।

"কিন্তু তা মনে রেখেও এখানে আমি বলতে চাই যে, 'লিপিকা'র সঙ্গে 'পুনশ্চে'র কোনো অব্যাহত যোগ নেই, পরম্পরায় সম্পর্ক নেই, 'পুনশ্চ' ঠিক 'লিপিকা'র পরবর্তী পরীক্ষা নয়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের এপারে-ওপারে দুই ভিন্ন রবীন্দ্রনাথকে

দেখতে পাই আমরা; প্রথম পর্বে যিনি একের পর এক তৈরি করেছিলেন নানারকম বন্ধনের চারুতা, দ্বিতীয় পর্বে তাঁর কাজ চলছিল কেবলই সেই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়ার আয়োজনে। পদ্য ছন্দেরও বাঁধন তিনি কাটতে শুরু করেছিলেন 'বলাকা' থেকে। 'বলাকা'য় সমিল মুক্তবন্ধ আর 'বাঁশি' ধরনের রচনায় অমিল মুক্ত বন্ধনের পর ছন্দমোচনের আর একটি স্তর রইল বাকি, আর সেই স্তরটিই সম্ভব হলো 'পুনশ্চ'তে। এই সম্ভাবনারর পূর্বমুহূর্তে তাঁকে দেখে নিতে হচ্ছিল অবনীন্দ্রনাথের চর্চা আর বিফলতার প্রকৃতি, বুঝে নিতে হচ্ছিল কোনখান থেকে সরে আসতে হবে তাঁকে। ... তাই গদ্যকবিতায় অবনীন্দ্রনাথের এই যাওয়া আর ফিরে আসাকে গণ্য করতে হয় তাঁর পদ্য রচনারই অনুষঙ্গ হিসেবে। উল্টো দিকে, সেই একই সঙ্গে এই বৃত্তান্ত আমাদের কাজে লাগে, হয়তো রবীন্দ্রনাথের কবিতাচর্চারও একটা নেপথ্য অধ্যায় বুঝে নেবার জন্যে।" শঙ্খ ঘোষ

১৩৩৪। বিচিত্রায় শ্রাবণ সংখ্যায় ছেপে বেরোল অবনীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের প্রথম কবিতা, 'পাহাড়িয়া'।

"জেগে ওঠার কিনারায় কিনারায় সুরের পাড় বোনে পাখী
একটা পাখী, না-দেখা পাখী, কানে-শোনা-পাখী!
উত্তর পাহাড়ের নিঃশ্বাস মন্ত্র আগলে রাখে
কুয়াসার জাদু দিয়ে;
পাখীকে চিনতে দেয় না, দেখতে দেয় না।..."

কিন্তু শ্রাবণে কবিতা ছাপানোর আগে আষাঢ়ের বিচিত্রায় আরও একটা কাজ করে বসলেন তিনি। লিখলেন গদ্য-ছন্দের আগমনী, প্রবন্ধের আকারে। না, 'নতুন ও পুরনোর ছন্দ'।

"সৃষ্টি হবার বেলায় গাছ ধরলে নতুনের ছন্দ, কিন্তু ফুল ফোটানোর ফল ধরানোর বেলায় ছন্দ বদল হল—গোড়াতে এল পুরোনো, আগাতে নতুন।"

তিনি জানালেন—

"পুরনো ডালে ধরা থাকে অগণিত নতুন জীবন-বিন্দু, গোপন ভাবে, পুরনোর কোল ছাড়ার উপায় নেই তাদের—যদিও তারা নতুন, সবাই প্রতীক্ষা করছে নব বসন্তের দূত এসে পৌঁছনোর।"

এই গদ্য ছন্দই বাংলা কবিতার পুরনো ডালে ছোঁয়াল নতুন বসন্তের হাওয়া, পুরনোর কোলে নতুন জাতের ফুল ফুটিয়ে।

বিচিত্রায় শ্রাবণ সংখ্যার পরই থেমে রইল না তাঁর কলম। বয়ে চলল, ব্যাকুল-আকুল ঝরনার মতো। নিচে তার তালিকা।

পাহাড়িয়া। বিচিত্রা। শ্রাবণ। ১৩৩৪
রংমহল। বিচিত্রা। ভাদ্র। ১৩৩৪
হাটবার। বেনু। আশ্বিন। ১৩৩৪

তিন দরিয়া। বিচিত্রা। আশ্বিন। ১৩৩৪

আতসবাজি। উত্তরা। কার্তিক। ১৩৩৪

আলোকশিখা। রংমশাল। ১৩৩৫

কোনো একটা সময়ে তাঁর গদ্য ছন্দের নদীতে এলো ভাটার টান। কবি অবনীন্দ্রনাথ চলে গেলেন অজ্ঞাতবাসে। তখনও কি বন্ধ হয়েছিল কবিতা লেখা? তখনি কি ভুলে গেলেন ছন্দের বৃষ্টিতে নৌকো ভাসানো? না। কবি অবনীন্দ্রনাথ ছড়িয়ে পড়লেন তাঁর গদ্যে। যে-জোয়ার আগে বওয়াচ্ছিলেন একটা নির্দিষ্ট নদীর কুল-কিনারা ছুঁয়ে, এখন তাকে বইয়ে দিলেন গদ্যের মাঠ-ঘাট, খেত-প্রান্তর ভাসিয়ে, ডুবিয়ে, টইটম্বুর করে।

তাঁর কবিত্বের সঙ্গে চূড়ান্ত সাক্ষাৎকারের পরও আরও এক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি থেকে যায় যেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, সঙ্গে সঙ্গেই অবনীন্দ্রনাথ হাতে তুলে নিলেন কলম, আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কলমে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল কবিতা, বিষয়টা কি সত্যিই জল পড়লে পাতা নড়ার মতো সহজ এবং যান্ত্রিক? নাকি এর উত্তর লুকনো আছে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের আত্মনির্মাণের কোনো গভীর আরাধনার আড়ালে?

পৃথিবীর শিল্প ইতিহাসের দিকে তাকালে বারংবার আমাদের চোখে পড়ে এক অশ্চর্য ঘটনা। যিনি শিল্পী তিনি কখনোই নিজেকে আটকে রাখতে পারছেন না আত্মপ্রকাশের জন্যে নির্ধারিত একটি মাত্র মাধ্যমে। তাঁকে অবিরল হাতছানি দিয়ে চলেছে অন্য শিল্পরূপ। এমন তো নয় যে, অবিরল ছেনী-হাতুড়ী ঠুকে ঠুকে ব্যর্থ হয়েছিলেন মাইকেলেঞ্জেলো মনের ছবিকে পাথরে ফোটাতে। তবুও তাঁকে সইতে হলো নির্মাণের আরেক প্রস্থ দহন, কবিতার দিকে হাত বাড়িয়ে। এই ভাবেই পাই ব্লেক, রসেটি, পিকাসো, পল ক্লী, ককতো, ভালিদের; যাঁদের দু-হাতে দু-রকমের মন্দিরা, ছবি এবং কবিতার।

ইতিহাসের আরও পিছন দিকে হাঁটলে চোখে পড়বে শিল্পী এবং কবির এই যুগ্ম সত্তার আরও সব নিদর্শন। প্রাচীন চীনে যেমন, প্রাচীন জাপানেও তেমনি এক সময়কার শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা ছিলেন কবিও। তাঁদের আখ্যা ছিল শিল্পী-কবি। চীনের ওআঙ উই, সুতুং পো আর জাপানের কোবো দাইশি, কাজান ওআনাবে এই গোত্রের শিল্পী। অবশ্য চীন-জাপানের বেলায় কবি-শিল্পীর এই যুগল-মিলন ঘটে যাওয়াটা অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক। লেখার আর ছবির জন্যে ওঁদের হাতে তো একই তুলির টান। ওঁদের তুলিতে ছবিও কবিতা, কবিতাও ছবি।

এখন আমরা সহজেই বিশ্বাস করতে পারি, অবনীন্দ্রনাথের কলমে কবিতার ফুলকি কোনো আকস্মিক উত্তেজনার ফলাফল নয়। সম্ভবত যে-সময়ে 'অগ্নি-উপাসক' অনুবাদ, কবিতার আগুন তখন থেকেই তাঁর আবেগের অন্তরঙ্গ সঙ্গী।

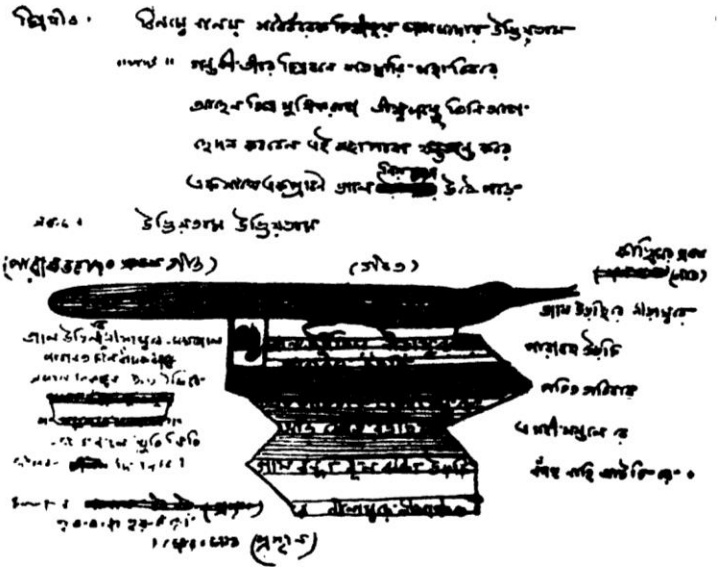

মিল-অমিলের ছন্দ

বিষয় ছিল, বোদলেয়ার। আলোচনার প্রথম স্তরে এলিয়ট বললেন, বোদলেয়ারকে সংগতভাবেই বলা হয়ে থাকে, 'a fragmentary Dante.' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বোদলেয়ারকে দাঁড় করালেন গ্যেটের পাশে, যা আপাতদৃষ্টিতে শুধু অস্বাভাবিক নয়, অকল্পনীয়। অথচ তুলনার মুহূর্তে তিনি আদৌ বিস্মৃত হয়নি গ্যেটের 'healthiness' এবং বোদলেয়ারের 'morbidity.' এমনকি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি যে, এই তুলনা, 'may seem Paradoxical.' তবুও দুই ঘোরতর অমিলকে মেলালেন এক সূত্রে। সূত্রটা এই—

'Restless critical, curious minds and the 'sense of the age'; both men who understood and foresaw a great deal'.

অবনীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দের সমগ্র সৃষ্টিকর্মকে এই মানদণ্ডে চাপিয়ে আমরা কি পারবো দুদিকের পাল্লাকে সমান সমান করতে? সে বড় জটিল এবং দুরূহ কাজ। সে-কাজে হাত লাগানোর আগে, এঁদের সৃষ্টির জগৎকে নিয়ে বোঝাপড়াটাকে মুলতবি রেখে, আমরা বরং ঘুরে তাকাই এই দুই স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনধারার দিকে। অর্থাৎ কবিকে ছেড়ে মানুষকে ধরি।

একটু তদন্ত করলেই দেখা যাবে, কবিত্বে যত না, তার চেয়ে অনেক বেশি, প্রাণবন্ত মিল এই দুটি মানুষের, সহজাত কুঁড়েমীতে। ঘরকুনো বাঙালি বলতে যা বোঝায়, এঁরা দুজনই তার সর্বোত্তম উদাহরণ। প্রথমেই ধরা যাক অবনীন্দ্রনাথের কথা।

হাতের সামনে সুযোগ এসেছে অফুরন্ত, পৃথবী পর্যটনের। সব ঠেলেছেন পায়ে। এমনকি সমস্ত ভারতবর্ষটাকেও দেখেননি ঘুরে-ফিরে। তাঁর সব চেয়ে দূরের পাড়ি, মুসৌরী, দার্জিলিং, মুঙ্গের। কাশ্মীর না, কন্যাকুমারিকা না, অজন্তাইলোরা না। কাশ্মীর যাননি। অথচ ছবি (Illustration) এঁকেছেন নিবেদিতার জন্যে, নিবেদিতার অনুরোধে, 'চার্ম অব কাশ্মীর'-এর। আগ্রার পাথরে পা পড়েনি তাঁর। তাজমহল দেখেননি চোখে। অথচ তাজমহলকে ঘিরেই তিন-তিনটে অবিস্মরণীয় ছবি। নিজের রচনায় তাজমহলের প্রসঙ্গ টেনেছেন নানা সময়ে। পুরী-কোণারকে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু পুরীতে না পৌঁছেও সমুদ্র-দর্শন করেছেন একবার। জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় বসে।

"সেবার আমরা অনেকজন এসেছি পুরীতে। বাবা-মা কলকাতাতেই আছেন। আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন আমার এক কত্তা-মা। কলকাতা থেকে পুরীতে বাবা আমাদের সমুদ্র-স্নানের ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলেন। আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, আমার স্বামী কত্তা-মাকে যেভাবে ধরে স্নান করাচ্ছেন, এবং আমি যেমন করে ঢেউ নিচ্ছি, সমস্ত দৃশ্যটাই হুবহু।"

উপরের কথাগুলো অবনীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে উমা দেবীর। তাঁর 'বাবার কথা' নামের বইটি থেকে আরও একটা ঘটনার উল্লেখ করছি, যাতে আরো স্পষ্ট করে চেনা যাবে এই ঘর-আগলানো মানুষটাকে।

"তখন দিদিমা মারা গেছেন, মার ইচ্ছে হলো তীর্থ করতে যাবেন। বাবা বললেন, 'যেতে হয়, তুমি মণিলাল কি অলকাকে নিয়ে চলে যাও। আমি যাব না।'

মা তাই করলেন। একবার মণিলালকে সঙ্গে নিয়ে আর একবার অলকাকে সঙ্গে করে পশ্চিমের দিকে সব ঘুরে এলেন—মথুরা, বৃন্দাবন, সাবিত্রী, পুষ্কর, আগ্রা, দিল্লি, ফতেপুর সিক্রী, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি। সেই সব দেখে আসবার পর মা একদিন বাবাকে বললেন, 'তুমি কি করে অমন ছবি এঁকেছো? আমি দেখে এলুম ও যে সব ঠিক তোমার আঁকা ছবির মত!"

বাবা তাঁর স্বভাবসুলভ মজা করে বললেন, 'তুমি চর্মচক্ষে যা দেখে এলে, আমি মর্মচক্ষে তা দেখতে পেয়েছি। তুমি এত খরচ করে হাঙ্গামা পুইয়ে দেখে এলে, আর আমি এই বারান্দায় বসে আগেই সব দেখে নিয়েছি। তবেই বোঝো, তোমার চেয়ে আমার পুণ্য কত বেশী।"

এমনিতে মজলিসি মানুষ। গল্প বলার রাজা। মুখের কথা যেন কবিতার ছন্দ। কিন্তু সেই মানুষই ঘরের বাইরে সভা-সমিতি অথবা বক্তৃতার নাম শুনলে অন্যরকম।